ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 891-897
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.303

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশুসাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ: নির্বাচিত পাঠ

পৃথ্বীশ মজুমদার, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Various stories from the Puranas have been prevalent for a long time. These are not merely tales that glorify gods and goddesses, but they also impart moral lessons and true knowledge to the entire human race. However, at the beginning of the nineteenth century, Hinduism began to face attacks from various directions. Especially in that situation, there was a strong need to rewrite the Puranas—an essential part of Indian tradition—in a way that would revive a sense of heritage among the people of India.

At the same time, it is also a social responsibility to sow the seeds of growth in young minds by awakening their consciousness. With this determination, Upendrakishor Roy Chowdhury, during that turbulent and rebellious period of the nineteenth century, composed stories from Indian traditional Puranas suitable for shaping the future of young minds. His objective was to provide true education to children and to introduce young readers to Indian heritage. He presented some of the stories from Indian traditional Puranas in the form of short, child-friendly narratives. Some such Puranic stories have been included in his work "upendrakishor samagra." In the present project, a discussion has been made on selected stories from among the twenty-six tales in his collection of mythological narratives.

At the beginning of the discussion, the story titled "indra howar sukh" has been analyzed. Taken from the "udyoga Parva" of the Mahabharata, the discussion highlights how the story was reconstructed to make it suitable for young readers. From this story, young readers learn that arrogance born of power ultimately leads to destruction. Similarly, from the story "ganesher bibaha," taken from the Shiva Purana, one learns that labor without wisdom is futile—that working with intelligence leads to proper and positive results. The next story is taken from the "Devi mahatmyam." From the story of "mahishasur," one learns that evil forces are inevitably destroyed and good ultimately triumphs. The subsequent story, "shumbha and sishumbha," also taken from the "Devi mahatmyam," teaches that arrogance and pride ultimately bring about destruction.

In this way, he reshaped the complex and heavy narratives of the original Puranas into forms suitable for young readers, awakening in them both an appreciation for the greatness of the Puranas and a sense of righteous wisdom.

Keywords: Puranic Stories, Moral Education, Children's Literature, Indian Heritage, Upendrakishor Roy Chowdhury

ঐতিহ্য বলতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে যা অর্জন করি তা বোঝায়। ভারত অনেক ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একটি দেশ। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় গোষ্ঠীর বসবাসের কারণে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখা আমাদের কর্তব্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি এবং সম্মান জানানোর বিষয়টি জাগানোর দায়িত্ব প্রবীণদের নিতে হবে। আমাদের মহান উত্তরাধিকার বজায় রাখতে হলে এটি শুরু থেকেই করা উচিত। নবীন প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা বড়দের দায়িত্ব। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে যেমন বৈচিত্র্যময় সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য ধরণের ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে আমাদের আছে বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদি রয়েছে। তেমনই ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল পুরাণ। পুরাণ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার মূলক রচনা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারা, যা ভারতে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব যার মধ্যে দিয়ে বহমান। পুরাণগুলি হল ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক গ্রন্থ। পুরাণ আমাদের ধর্মের মেরুদন্ড, যা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

আধ্যাত্মিক পটভূমিতে লিখিত হলেও পুরাণ কথার মধ্যে রয়েছে নীতিবোধ- যা অপরাপর ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরারই প্রকাশক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরম্পরা বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নতুনের মধ্যে পুরাতনের স্বভাব ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকাশ না হলেও নির্মাণের মধ্যে ভাবগত ঋণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। স্বভাবতই এই সমস্ত পুরাণ গুলি পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের নানা রীতির মধ্যে অনুসৃত হয়েছে; নির্মিত হয়েছে তার নব নব বয়ান। সহজ কথায় এই নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করায় হল পুনর্নির্মাণ। পুরাণের নানান কাহিনি গুলি যত পুনর্নির্মিত হয়েছে ততই সেই কাহিনি গুলি নতুন ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ভালো মন্দের বিষয় জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সকলের মধ্যে বিশেষ বোধ জাগ্রত করায় ছিল পুরাণ গুলি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত ‘ছান্দোগ্য উপনিষদ’ এ পুরাণের একটি প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকমতে, মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব পুরাণ সমূহের সংকলন করেন। ঐতিহ্যগত ভাবে, পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। পুরাণে সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মান্ডের ইতিহাস, ঋষি, উপদেবতাগণের বংশ বৃত্তান্ত, হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এই পুরাণ গুলিতে পৌরাণিক কাহিনি, সৃষ্টির গল্প, দেবতাদের লীলা মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রাচীনকালের পুরাণের কাহিনিগুলি আধুনিককালে নানান সাহিত্যিকদের রচনায় পুনর্নির্মিত হয়েছে। উনিশ শতকে পদার্পণ করেও এই পুরাণের কাহিনি গুলি নানান ভাবে রচিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়টি আরও দৃঢ় হয়েছে। তাই উনিশ শতকে এসেও সেই ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধানে নানান ভাবে পুরাণের কাহিনি গুলি নিয়ে লেখা হয়েছে। উনিশ শতক পরিবর্তনের যুগ এবং সেই পরিবর্তন এসেছে সারা শতক জুড়ে যুগপৎ ভাঙা গড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে।

উনিশ শতকের সূচনাকাল বঙ্গদেশের জাতীয় জীবনে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। নানান বিতর্ক থাকলেও ভাবগত ক্ষেত্রে নবজাগরণের সুচনাকাল বলে সকলেই এই সময়পর্বকে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাচর্চার কাঠামোকে অনুসরণ করেই নতুনাভাবে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাচর্চা; মূলত শিশুশিক্ষার সূচনা উনিশ শতকেরই অবদান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নানা বিষয়ে দ্বান্দিকতা উনিশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় স্তরে যার প্রকাশ নানাভাবে বাঙালী জাতিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে নানান দিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগলো। প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন খ্রিস্টান মিশনারিগণ। উদ্দেশ্য ছিল এই হিন্দু ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করা। কিন্তু হিন্দু

ধর্মের শিকড় এতই শক্ত ছিল যে, আঘাতে তার মূল উৎপাটিত হয়নি। সেই সঙ্গে উনিশ শতক সমাজ সংস্কারের যুগ- জাতীয়তাবাদী চেতনার যুগও বটে। মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা উনিশ শতকের সেই লক্ষণ স্পষ্ট। উনিশ শতকের আন্দোলনের মধ্যে, উত্তাল সামাজিক পরিস্থিতিতে সকল মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেই পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ছিল তখনকার সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য। কারণ আজ যারা ছোট, আগামী দিনে তারাই বড় হয়ে দেশ সমাজের হাল ধরবে। তবে ছোটদের জন্য কিছু লেখা মস্ত ঝক্কির কাজ, কারণ বড়রা সব বোঝে, তাই তাদের জন্য সব লেখা যায়, কিন্তু ছোটদের বোঝার ক্ষমতা কম, তাই তাদের উপযোগী করে হাস্যরসের মিশ্রণে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে সেই সঙ্গে ভৌতিক গল্প সমূহ রচনা করায় শ্রেয়। এই শিশু সাহিত্যের জনক বলা হত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। তিনি বিভিন্ন পুরাণের গল্প রচনা করেছিলেন এবং সেগুলিকে তিনি শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছিলেন। সেই সময় আমরা তাঁর পাশাপাশি আরো কিছু সাহিত্যকদের লক্ষ্ করি, যাঁরা শিশুদের জন্য লিখেছেন। যেমন - "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান। / শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুদের জন্য লেখা এই ছড়া খুবই প্রচলিত। এখানেও পুরাণের শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে এই ছড়াগুলিতে পুরাণের শিবের কথা এলেও তা ভারি অর্থ বর্জন করে শিশু পাঠকদের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "ছড়াগুলিই শিশু-সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। ছড়াগুলি ভারহীনতা, অর্থবন্ধন শূন্যতা এবং বৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে- শিশু- মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[১]

উপেন্দ্রকিশোর এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমসাময়িক। সেই সময় রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন 'ছেলেভুলানো ছড়া'। পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোরও ছোটদের জন্য লিখিতে ভালোবাসতেন। তবে এই লেখালেখির জগতে তিনি কিভাবে এলেন তা বলে নেওয়া যাক।

বর্ণপরিচয়ের পূর্বেই খেলার পাশাপাশি ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া ও রূপকথার মাধ্যমে সাহিত্যের সঙ্গে মানব শিশুর প্রথম পরিচয়। আধুনিক সাহিত্য পাঠক রূপে প্রাপ্ত বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই সূত্রেই 'শিশুসাহিত্য' এই কথাটির উদ্ভব।প্রায়ই দেখা যায়, যে সব গ্রন্থ শিশুদের জন্য রচিত হয়নি, সেসবের মধ্যে কিছু গ্রন্থ অনায়াসেই শিশু পাঠককে আকৃষ্ট করে। রামায়ণ, মহাভারত এছাড়াও পুরাণ কেন্দ্রিক নানান দেব - দেবীর গল্প ইত্যাদি যেকোনো সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে এ কথা সত্য। বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম নিশ্চিত ভাবেই লোকসাহিত্যের সীমায়- রূপকথা, উপকথা, পুরাণ জাতীয় গল্প এছাড়াও নানাবিধ ছড়ার জগতে। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা শিশুসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বিশেষভাবে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। রাজেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী **১৮৯৯** সালে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমনির ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম 'শিশু সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন।১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশের সাথে সাথে বাংলা শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন হল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার। শিশু কিংবা কিশোরের শব্দ ভান্ডার বয়স্কদের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। উনিশ শতকের শেষদিকের একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ছিলেন শিক্ষাবিদ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। " অ- অজগর আসছে তেড়ে / আ- আমটি খাব পেড়ে।" উচ্চারণ করে এখনও পর্যন্ত বাঙালি শিশুর বর্ণপরিচয় হয়ে থাকে। শিশুপাঠ্য রচনায় তিনিই প্রথম চলতি বাংলা ব্যবহার করেন। শিশুসাহিত্য রচনায় তেমনি জনপ্রিয় একজন হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর জন্ম **১৮৬৩** সালের **১১** মে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মসূয়া গ্রামে। তাঁর

পিতা শ্যামসুন্দর রায়চৌধুরী, মাতা জয়তারা রায়চৌধুরী। **১৯১৩** সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই পত্রিকাটি বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা করে। 'সন্দেশ' স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোরের গ্রন্থ সংখ্যা সাতটি। সেগুলি হল- সেকালের কথা, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, গুপী গাইন বাঘা বাইন, এছাড়াও প্রচুর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, পুরাণের গল্প ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর লোককথা বা রূপকথার আঙ্গিকে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির কাহিনি পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিশুপাঠ্য রচনার প্রায় সবগুলিই সাধু ভাষায় রচিত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণ কথাকে উপেন্দ্রকিশোর প্রায় লোককথার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন সমকালীন নানান বিষয় জানার পাশাপাশি গুটি গুটি পায়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের পুরাণের নানান বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি।

ভারতের জ্ঞান ভান্ডারে যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, পুরাণ গ্রন্থ সেগুলোর মধ্যে এক অমূল্য রত্ন বিশেষ। পুরাণ আমাদের ভারতের ঐতিহ্য। উপেন্দ্রকিশোর সেই ঐতিহ্যকে দেশের কচিকাঁচাদের ভালোভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে পুরাণের সেই ভারি ভারি কাহিনি গুলিকে ছোট ছোট গল্পাকারে নানান ছবি সহকারে শিশুদের উপযোগী করে তিনি উপহার দিয়েছিলেন শিশুদের। আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই জানি, বিদ্যালয়ে থাকতেই তিনি আঁকিয়ে হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাই শিশুদের জন্য লেখার পাশাপাশি সেইসব লেখার জন্য বিভিন্ন ছবিও তিনি নিজেই আঁকতেন। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য পুরাণের কিছু কিছু কাহিনিকে তিনি শিশু উপযোগী ছোট ছোট গল্পাকারে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেইরকমই কিছু পুরাণের গল্প। উপেন্দ্রকিশোর সহজ ভাষায় শিশুদের সেই সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করছিলেন। সর্বোপরি পুরাণের এই ঐতিহ্যবাহী কাহিনি গুলিকে শিশুদের বোধগম্য করে পরিবেশন করার জন্য সেগুলোকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'পুরাণের গল্প' ছাব্বিশটি পৌরাণিক কাহিনির সংকলন। বর্তমান প্রকল্পে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌরাণিক কাহিনি সংকলনের ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা হয়েছে।

'ইন্দ্র হওয়ার সুখ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিতে দম্ভ ও দর্পের পরাজয়ের ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মূল মহাভারতের 'উদযোগ পর্ব' এর এই আখ্যানে আমরা দেখতে পায় নহুষ নামক একজন রাজা প্রথমে ধর্মপথের অনুসারী ছিলেন। এই প্রজাপালনে রত, সুবিনয় রাজাকে ইন্দ্র পদে মনোনীত করেন মহর্ষিরা। কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার কিছু পরেই তার চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির পর সেই রাজা দাবি করেন- "ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেননা কেন? উনি সত্বর আমার গৃহে আসুন"।[২] তখন ব্যথিতা শচী দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে আশ্রয় নেন এবং পরে ইন্দ্রের পরামর্শে নহুষকে জানান - দেবরাজ যদি তার একটি ইচ্ছা পূরণ করেন, তবে তিনি সর্বদা তার বশগামিনী হবেন। তিনি বলেন - "...... আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ আপনার শিবিকা বহন করুন।"[৩] এই কথা শুনে নহুষ ঋষিদের অভিসম্পাতে বিনষ্ট হন। আর উপেন্দ্রকিশোর তাঁর পুরাণের গল্পে নহুষের এই ইন্দ্রপরায়ণ ছবি বাদ দিয়ে তিনি যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে আমারা দেখতে পায় ক্ষমতায় মত্ত এক রাজাকে। তিনি শিশুদের জন্য এটি রচনা করেছেন বলেই হয়ত শচী প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে উপেন্দ্রকিশোরের রচনায়। কিন্তু তিনি এর মধ্যে দিয়ে তাঁর শিশু পাঠকদের খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, ক্ষমতার দম্ভ আসলে বিনাশই ডেকে আনে।

'গনেশের বিবাহ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিটিতে আমরা দেখি, কার্তিক আর গনেশ যখন বড়ো হলেন তখন একটা কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হল যে, কে আগে বিবাহ করবে? তাঁদের এই তর্ক শুনে

শিব এবং পার্বতী দুজনেই বড়ই ভাবনায় পড়লেন। তখন শেষে অনেক ভেবে শিব স্থির করলেন কার্তিক এবং গনেশের মাধ্যমে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে পারবে, তাঁর বিবাহই আগে দেওয়া হবে। একথা শোনা মাত্রই কার্তিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বাহির হলেন। কিন্তু গনেশের তো ভুঁড়ি - তা নিয়ে তিনি ছোটাছুটি করে তাড়াতাড়ি ফিরবেন কি করে- এই চিন্তায় পড়লেন তিনি। মনে মনে এক চমৎকার যুক্তি স্থির করলেন যে, তিনি শিব এবং পার্বতী অর্থাৎ তাঁর পিতা মাতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবেন। এবং তিনি করলেনও তাই। তারপর জোরহাতে তাঁদেরকে বললেন- “এখন তবে আমার বিবাহ দিন।” [৪] তখন শিব বললেন কার্তিকের আগে যদি গনেশ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে পারে, তবে তাঁর বিবাহ আগে দেওয়া হবে। তখন গনেশ জানান তিনি সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। বেদে আর শাস্ত্রে আছে পিতা মাতাকে প্রদক্ষিণ করলে তাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়। একথা শুনে শিব বললেন - তাইতো এ তো একদম ঠিক কথা। তখনই গনেশের বিবাহের আয়োজন করা হল। ‘শিবপুরাণ’ এর অন্তর্গত এই আখ্যানটিকে উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছেন। আসলে তিনি এর মধ্যে দিয়ে শিশু পাঠকদের খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, বুদ্ধিহীন পরিশ্রম বৃথা, অর্থ্যাৎ বুদ্ধি দিয়ে কোন কাজ করলে অবশ্যই তার সঠিক এবং ভালো ফল লাভ ঘটে।

উনিশ শতকের সূচনাকালে নানাদিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগলো। প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিগণ। ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে ভারতের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাদের মতে হিন্দু ধর্মই ছিল অধঃপতিত - যার মূল পর্যন্ত পঁচে গেছে এবং যা সংস্কারেরও অযোগ্য। প্রকৃতপক্ষেই শিশুরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, সেই সময়ই উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য পুরাণকে নব জাগরিত করার জন্য পুরাণের গল্পগুলি রচনা করলেন। উনিশ যে সময় চারিদিকে উত্তাল, ভয়াবহ পরিস্থিতি, দাঙ্গা, বিদ্রোহ, শুভ অশুভের লড়াই বেঁধেছিল, সেই রাজনৈতিক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শুভবোধ জাগরিণের এই পুরাণ গল্পগুলি লিখেছিলেন - যা শুধুমাত্র শিশুদের নয়, সেই সঙ্গে আপামর ভারতবাসীর মধ্যে নতুন করে শুভ বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিরচিত তেমনি একটি কাহিনি ‘মহিষাসুর’। প্রত্যেকটি বাঙালিই এই চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সেই চরিত্রটিকেই উপেন্দ্রকিশোর পুনরায় তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। এই কাহিনিতে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয়গান গীত হয়েছে। পূরানের বহু প্রচলিত এই কাহিনি অনুযায়ী এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল - সে মহিষ সেজে বেড়াত, তাই তাকে মহিষাসুর বলা হত। দেবতারা কিছুতেই তার সাথে যুদ্ধে জিততে পারতেন না। এমনকি এই মহিষাসুর দেবতাদের, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এরপর সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হন এবং শিব ও বিষ্ণুর, সেই সঙ্গে সকল দেবতাদের শরীর থেকে তেজ বের হল। সকল দেবতার অস্ত্র, বস্ত্র, বর্ম, অলংকারের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে সেই দেবী গেলেন মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধ করতে। শেষ পর্যন্ত মহিষাসুর বধ হয়েছিল দেবী দুর্গার হাতে। বহু প্রচলিত হিন্দুধর্মের এই কাহিনিকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন মূলত শুভ শক্তিকে জাগ্রত করতে। তবে তার পাশাপাশি তা শিশুদের উপযোগীও হয়ে উঠেছে। শিশুদের কাছে অ্যাকশন জাতীয় গল্প হোক বা অন্যান্য রচনা, অ্যাকশন তাদের বেশ আনন্দ দেয়। এবং এই কাহিনিতে আমরা দেখি দেবী দুর্গা এবং মহিষাসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ - যা একাধারে যেমন শিশুদের মনে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয়গানকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার পাশাপাশি এই কাহিনি শিশুকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। তাই এই কাহিনি অনেকবেশি শিশুপযোগী হয়ে উঠেছে।

উপেন্দ্রকিশোর যে সময়ে বসে এই পুরাণের গল্পগুলি লিখেছিলেন, তার কিছুকাল আগেও সমাজে এক ভয়ানক পরিস্থিতি ছিল, দাঙ্গা, লুটপাট ইত্যাদি লেগেই ছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের মনে তা গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের আধার এই পুরাণের গল্পগুলি সেই সমস্ত বেড়ে ওঠা শিশুদের মন থেকে এই সমস্ত দাঙ্গা, বিদ্রোহের ক্লেশকে দূর করে তাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে হিন্দু ধর্মের উপর যেভাবে নানাদিক থেকে আক্রমণ আসতে শুরু করেছিল, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাতে সেই হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য পুরাণ স্থান পেয়ে মূলত ভারতীয় ঐতিহ্যের জয়কেই সূচিত করেছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিরচিত ‘পুরাণের গল্প' এর অন্তর্গত ‘শুম্ভ - নিশুম্ভ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিতে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের পরাজয়ের ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ হল দুইজন হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র। শাক্ত ধর্মগ্রন্থ ‘দেবী মাহাত্ম্যম্' অনুযায়ী এরা অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গা সংক্রান্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনিটি হল শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কাহিনি। গ্রন্থের উত্তর চরিত্র বা তৃতীয় খন্ডে বিধৃত পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই অসুর ভ্রাতা স্বর্গ ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ অধিকার করে নিলে দেবগন হিমালয়ে গিয়ে বৈষ্ণব শক্তি মহাদেবীকে স্তব করতে লাগলেন। এমন সময় সেই স্থানে পার্বতী গঙ্গা স্নানে উপস্থিত হলে আদ্যাদেবী ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে তাঁর দেহকোষে থেকে নির্গত হলেন। এই দেবী কৌশিকী নামে অখ্যাত হলেন এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এদিকে অসুর দ্বয়ের চর চন্ড ও মুন্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজ প্রভু দ্বয়কে তাদের কথায় বললেন - এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক তাদের ভোগ্য হবার যোগ্য। এরপর শুম্ভ নিশুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে দেবীর নিকট কুপ্রস্তাব প্রেরণ করে, এবং দেবীও তা শুনে মৃদু হেসে বিনীত স্বরে বলেন - এই বিশ্বে শুম্ভ নিশুম্ভের মতো বীর আর কেউ নেই। তবে দেবী পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে দেবীকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে, কেবলমাত্র তাকেই দেবী বিবাহ করবেন। এখন তিনি তো প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবেন না। এরপর শুম্ভ নিশুম্ভের সাথে দেবীর যুদ্ধ হয়। আর শেষ পর্যন্ত দেবীর কাছে তারা পরাজিত হয়। দেবী দুর্গা নিশুম্ভকে বধ করেন এবং যুদ্ধান্তে দেবী শুম্ভকে শূলে গ্রথিত করে বধ করেন। দেবতারা পুণরায় স্বর্গের অধিকার ফিরে পান।

তবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পুরাণের গল্পে দেবীর প্রতিজ্ঞায় বিষয়টিকে বাদ দিয়েছেন। সেই স্থানে দেবী বলছেন - তার ছেলেমানুষী খেয়াল হয়েছে যে, যে তাঁকে যুদ্ধে হারাতে পারবে না, সে দেবীকে বিবাহ করতে পারবে না। ‘দেবী মাহাত্ম্যম্' এ দেবী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা বলতে বোঝায় আগে থেকেই কিছু সংকল্প বা অঙ্গীকার করা। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর যেহেতু শিশু পাঠকদের জন্য এই কাহিনি রচনা করেছেন তাই তাঁর কাহিনিতে দেবীর হঠাৎ করেই খেয়াল হয়েছে যে, যুদ্ধে তাঁকে হারাতে না পারলে তিনি বিবাহ করবেন না। আসলে শিশুরাও তো এমনি হয়ে থাকে। কোনো কিছু আগে থেকেই ভেবেচিন্তে তারা করেনা। তাদের যা খেয়াল হয় হঠাৎ করে, সেই কাজই তারা করে ফেলে। সুতরাং, এই কাহিনিতে উপেন্দ্রকিশোরও যেন দেবীকে শিশুদের মতোই তাদের উপযোগী করেই নির্মাণ করেছেন। তাই দেবীরও হঠাৎ খেয়াল হয়েছে। এর পাশাপাশি কবি তাঁর শিশু পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, ঔদ্ধত্য ও অহংকার আসলে বিনাশই ডেকে আনে। তাই এই কাহিনির শেষেও লক্ষ্য করা গেল শুম্ভ ও নিশুম্ভ হল ঔদ্ধত্য ও অহংকারের প্রতীক, যাঁরা দেবীর বিনয় ও প্রজ্ঞার নিকট পরাস্ত হল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বুঝতে পুরাণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাদান। ভারতীয় ঐতিহ্য- সংস্কৃতির ইতিহাস এই পুরাণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে

উপেন্দ্রকিশোর যে পুরাণকে ফিরে দেখেন, তা মানবিকতার জয়পতাকাকেই তুলে ধরতে চায়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মূল পাঠক শিশুরা। সমাজের নানান নিয়ম রীতি রাজনীতির জটিলতায় তাদের মন তখনও পঙ্কিল হয়ে ওঠেনি। একদিকে তাদের মধ্যে ছিল অজানাকে জানার ইচ্ছা, অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষা। পুরাণের এই সমস্ত কাহিনি কম বেশি আমারা সকলেই জানি। তবে উপেন্দ্রকিশোর এই পুরাণের কাহিনিকে ছোট ছোট গল্পাকারে বীর, কখনো হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তাঁর শিশু পাঠকদের জন্য পুনর্নির্মাণ করে তাদের এক প্রাঞ্জল পাঠ্য উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচিত গল্পগুলির মূল কাহিনি পুরাণ নির্ভর হলেও উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব সাবলীল গল্প বলার ধরণটি কাহিনি গুলিকে সরল ও সরস করে তুলেছে। উপেন্দ্রকন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থনে বলেছেন-

> “ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা বড় ভালোবাসতেন। শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই আনন্দে তিনি হাসি- খেলা- নাচ- গানে মেতে উঠতেন। ছোটদের ভালোবাসতেন, তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর সহজ মিস্টি হত তাঁর লেখা।”[৫]

এভাবেই দেখা যায়, সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পাশাপাশি শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর এই সকল রচনায়। তাই তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা স্বল্প পরিমাণের হলেও সেগুলি অমর হয়ে একাধারে আনন্দ এবং শুভবোধ সঞ্চার করে চলেছে।

ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডারের প্রাচীন গ্রন্থ পুরাণ গ্রন্থ গুলির কাহিনি গুলিকে শিশু সাহিত্যকার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর রচিত ‘পুরাণের গল্প’ এর ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে নির্বাচিত চারটি গল্পে ‘ইন্দ্র হওয়ার সুখ', ‘গনেশের বিবাহ’, ‘মহিষাসুর’, ‘শুম্ভ নিশুম্ভ’ তে কিভাবে নতুন করে শিশুদের উপযোগী পাঠ্য হিসেবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এবং এই পুনর্নির্মাণের ফলে এই বিষয়গুলি নতুন দেখতে পেলাম যে, মূল মহাভারতের ‘উদযোগ পর্ব’ এর নহূষের ইন্দ্র পরায়ণতাকে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ‘ইন্দ্র হওয়ার সুখ' শিরোনামাঙ্কিত গল্পে বাদ দিয়ে সেখানে তিনি তাকে করে তুলেছেন ক্ষমতায় মত্ত এক রাজা। আর শিশুপাঠ্য বলে শচী প্রসঙ্গও বাদ পড়েছে। ‘শিবপুরাণ’ থেকে নেওয়া ‘গনেশের বিবাহ' এই গল্পটিতে তিনি নিছক একটি পুরাণের গল্পের বদলে এর পুনর্নির্মাণ করে এটাই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধিহীন পরিশ্রম বৃথা। ‘দেবী মাহাত্ম্যম্' থেকে গৃহীত ‘মহিষাসুর’ কাহিনিটিকেও প্রচলিত মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনি থেকে কিছুটা বদলে, এর ভাষাকে শিশুদের উপযোগী করে অ্যাকশন, হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন এবং এক্ষেত্রেও শিশু পাঠকদের শিক্ষা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। লোকসাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৪৫।

২. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। মহর্ষি শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, মহাভারতম্। উদযোগ পর্ব, প্রথম খণ্ড।

৩. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। মহর্ষি শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, মহাভারতম্। উদযোগ পর্ব, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত।

৪. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, শিবপুরাণম্। কলকাতা, ১৩১৪, পৃ. ১৪০।

৫. চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। ছেলেবেলার দিনগুলি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।

৬. রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।